পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

পরিবেশ ও মানবজীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। পরিবেশের ভাল-মন্দ দুটো দিকই মানুষসহ সমগ্র জীব জগতের অস্তিত্বের জন্য গুরুত্ব বহন করে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ডের কারণে আজ পৃথিবীর পরিবেশ হুমকীর সম্মুখীন। শিল্পায়ন, জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর পরিবেশ আজ বিপন্ন। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গলে যাচ্ছে মরু অঞ্চলের বরফ। বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। এর বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশের মতো সমুদ্র উপকূলীয় দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থায়।

বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা, এদেশে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পানিসম্পদ রক্ষায় সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও নদী খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন

বিশ্ব পরিবেশবাদ আন্দোলনে স্টকহোম কনফারেন্স একটি মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পরিবেশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বৃহৎ পরিসরে দেখার সুযোগ করে দেয়। স্টকহোম কনফারেন্সে (UN Conference on the Human Environment) প্রায় ১১৩টি দেশ, ১৯টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রায় ৪০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। স্টকহোম কনফারেন্স এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কেনিয়ার নাইরোবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্যা কনজারভেশন অব নেচার (IUCN)। স্টকহোম কনফারেন্সের ফলে বিশ্বে পরিবেশগত বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (Environmental Agencies)/মন্ত্রণালয় গঠিত হয় এবং অনেক দেশেই জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়।

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ও বিশ্ববাসীকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণে জনমত সৃষ্টির জন্য ১৯৮৮ সালে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC)। সম্প্রতি আইপিসিসির প্রকাশিত প্রতিবেদন সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন কী হারে ঘটছে এবং করণীয় সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সজাগ করা হয়। আইপিসিসি-কে উক্ত গবেষণামূলক প্রতিবেদনের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বর্তমানে উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে বিশ্ব সম্প্রদায় একজোট হয়ে কাজ করছে।

ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের বিরূপ প্রভাব হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাসেল কনভেনশন, রটারডাম কনভেনশন ও স্টকহোম কনভেনশন গৃহীত হয়েছে এবং এর আওতায় নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষার জন্য গৃহীত হয়েছে মন্ট্রিল প্রটোকল এবং ওজোন স্তর ক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাসের কার্যক্রমও বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাপানের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্যের পরিমান হ্রাস, পুনঃ ব্যবহার ও পুনঃ চক্রায়ন অর্থাৎ 3R পদ্ধতির আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছে। উক্ত পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রতি উন্নত বিশ্ব বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

কিয়োটো প্রটোকল

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে কিয়োটা প্রটোকলের নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে কার্যকর হয়েছে। জুন ২০০৮ পর্যন্ত বিশ্বের ১৮২টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থিত (Ratified) হয়েছে। উল্লেখ্য এ পর্যন্ত ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কিয়োটো প্রটোকল অনুসমর্থিত হয়েছে। এ প্রটোকলের আওতায় বিশ্বের ৩৬টি দেশকে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের (GHG) মাত্রা ১৯৯০ সনের মাত্রার নীচে নামাতে হবে। কিয়োটো প্রটোকল বনায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাতাসের কার্বন শোষণ করে এরূপ কার্যক্রম, যেমন বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণ মাত্রা হ্রাসে সহায়তা করে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০-২০০৪ পর্যন্ত গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনকারী বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ এ দেখা যেতে পারে।

সারণি ১৫.১: বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনের বিবরণ

দেশের নাম	গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনে পরিবর্তন (১৯৯০-২০০৪)	ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (২০১২ সালের মধ্যে)	চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা (২০০৮-২০১২)
জার্মানী	-১৭%	-২১%	-৮%
কানাডা	+২৭%	পাওয়া যায়নি	-৬%
অস্ট্রেলিয়া	+২৫%	পাওয়া য়ায়নি	+৮%
স্পেন	+৪৯%	+১৫%	-৮%
যুক্তরাষ্ট্র	+১৬%	পাওয়া যায়নি	-৭%
নরওয়ে	+১০%	পাওয়া য়ায়নি	+১%
নিউজিল্যান্ড	+২১%	পাওয়া য়ায়নি	০%
ফ্রান্স	-০.৮%	০%	-৮%
গ্রীস	+২৭%	+২৫%	-৮%
আয়ারল্যান্ড	+২৩%	+১৩%	-৮%
জাপান	+৬.৫%	পাওয়া যায়নি	-৬%
যুক্তরাজ্য	-১৪%	-১২.৫%	-৮%
পতুর্গাল	+৪১%	+২৭%	-৮%
ইউরোপীয় ইউনিয়ন-১৫	-০.৮%	পাওয়া যায়নি	-৮%
চীন	+৪৭%	-	-
ভারত	+৫৫%	-	-

উৎসঃ http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol.

কাজাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থিত হয়নি। চীন এবং ভারত গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও তাদের ক্ষেত্রে ইইউর নির্গমন মাত্রা প্রযোজ্য নয়।

বক্স নং ১৫.১: বৈশ্বিক উষ্ণতাঃ বিপদে উন্নয়নশীল দেশ

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলো। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, এশিয়া ও আফ্রিকার খাদ্যাভাব বেড়ে যাওয়াসহ প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তির আশংকা বাস্তব হয়ে যেতে পারে বিজ্ঞানীদের অনুমিত সময়ের অনেক আগেই। এর ফলে মালদ্বীপসহ বাংলাদেশের মত উপকূলীয় দেশগুলো ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হবে। জাতিসংঘের আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেলের (IPCC) তৃতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা ৪৫ সেঃমিঃ বাড়লে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূখন্ড সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে। IPCC এর গবেষণা মতে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১৮ সেঃ মিঃ হতে ৫৯ সেঃ মিঃ এ উন্নীত হবে। Institute for Water Modelling এর গবেষণা প্রতিবেদনে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩২ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বাড়লে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের ৮৪ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা করা হয়েছে। Bangladesh Centre for Advanced Studies গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ সেঃ মিঃ বাড়লে এদেশের জনজীবনে আর্থ সামাজিক বিপর্যয় ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা হুমকীর সম্মুখীন হবে।

জাতিসংঘের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫-২.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (২.৭-৪.৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট) বৃদ্ধি পেলে প্রাণী ও উদ্ভিদের এক তৃতীয়াংশ প্রজাতি হুমকীর সম্মুখীণ হবে। তা ছাড়া এশিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের একশ কোটিরও বেশী লোক ২০৫০ সালের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো তলিয়ে যেতে পারে। আফ্রিকা সাব-সাহারা অঞ্চলের খরা আরও বাড়বে। রিপোর্টে বলা হয় বিশ্বের তাপমাত্রা ২১০০ সালের মধ্যে ১.১ ডিগ্রী থেকে ৬.৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়তে পারে।

Clean Development Mechanism (CDM)

কিয়োটো প্রটোকলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল Clean Development Mechanism (CDM), যার আওতায় উন্নত বিশ্বের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসের পরিবর্তে উন্নয়নশীল (এনেক্স-বি ভুক্ত ৩৯টি দেশ) দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে 'Certified Emission Reduction' (CER) ক্রেডিট নিজের খাতে জমা করতে পারবে। এর ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশ উপকৃত হতে পারে। ঢাকা মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে Clean Development Mechanism-এর আওতায় ঢাকার বিভিন্ন বাজার থেকে প্রতিদিন ৭০০ মেঃ টঃ পচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করে কম্পোস্ট সার তৈরী করা হবে। এর ফলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-এর ৭০০ মেঃ টঃ বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের ব্যয় সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি বর্জ্য হতে জৈব সার পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি UNFCCC-এর আওতায় সিডিএম নির্বাহী বোর্ড অনুমোদন করেছে। বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট সার তৈরী করার ফলে প্রতি বছর ৯,০০,০০০ মেঃ টঃ গ্রীন হাউজ গ্যাস উদগীরণ বন্ধ হবে, যা সিডিএম এর আওতায় Certified Emission Reduction (CER) হিসেবে বিক্রি করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সিডিএম নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক ১৪৩১ টি সিডিএম প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে। এ সব প্রকল্পের গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমান প্রায় ২২০ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাসের সমপরিমাণ। ২০১২ সালের শেষে এর পরিমাণ হবে প্রায় ১২৫০ মিলিয়ন টন।

বাংলাদেশের পরিবেশগত মূল সমস্যাদি

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে খরা ও বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্যাদির মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, বসতির কারণে বনাঞ্চলে অযাচিত অনুপ্রবেশ এবং ক্ষতিকর শিল্পবর্জ্যের যথেচ্ছ নিক্ষেপণের কারণে ভূমির কার্যকর গুণাবলীর অবক্ষয় ঘটেছে। উপকুলীয় এলাকার মৃত্তিকায় অবক্ষয় ঘটছে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে।

দেশের ভূউপরিস্থ পানি, শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, পৌর এলাকার অপরিশোধিত বর্জ্য পানি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, তৈল বাহিত দূষণ এবং নদীবন্দর ও উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রবন্দর ও জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ড থেকে নিসৃত তৈল জাতীয় পদার্থ দ্বারা ক্রমাগত দূষিত হয়ে চলছে। বাংলাদেশে বর্তমানে, বিশেষ করে চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালীসহ অন্যান্য জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি একটি মারাত্মক জাতীয় সমস্যা।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্তের অপর পার থেকে প্রবাহিত ৫৭টি নদী রয়েছে। এই ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টির ক্ষেত্রে ভারত ও ৩টির ক্ষেত্রে মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ যৌথ অংশীদার। এসব নদীর উজানে সেচ ও অন্যান্য প্রয়োজনে পানি উত্তোলনের কারণে আন্তর্জাতিক সীমারেখার অপর পার হতে আগত নদীসমূহ থেকে পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ এক্ষেত্রে একটি আলোচিত উদাহরণ। গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের ফলে বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে খরা পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। এছাড়া ভারতের আন্তঃ বেসিন নদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে বার্ষিক পানি প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে যা দেশের অর্থনীতি, সমাজ এবং পরিবেশের ওপর অপরিসীম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

সমগ্র পৃথিবীজুড়ে মানবসৃষ্ট যে সকল পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে চলেছে, বায়ুদূষণ সেগুলির একটি। বাংলাদেশে বায়ুদূষণের উৎস দু'টিঃ যানবাহন ও শিল্প কারখানা থেকে নিসৃত কালো ধোঁয়া। এ দু'টি উৎস মূলত নগরাঞ্চলে বেশী মাত্রায় বিরাজমান। বায়ু দূষণের অপর উৎস হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে মূলত শুষ্ক ঋতুতে পরিচালিত অসংখ্য ইটের ভাটাও রয়েছে। এ সকল ইটের ভাটায় অধিকাংশ জ্বালানী হিসেবে কয়লা ও কাঠ ব্যবহার করা হয়, যা থেকে নিঃসরণ হয়ে থাকে সালফার ডাই অক্সাইড ও উদ্বায়ী জৈবযৌগ। বায়ুতে যানবাহন থেকে নিসৃত লেড এর উচ্চমাত্রায় উপস্থিতি নগর ও শহরাঞ্চলে একটি মারাত্মক সমস্যা। মানব স্বাস্থ্য বিশেষ করে শিশু স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক।

মানবসৃষ্ট বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দ্বারা ভূমি, বনাঞ্চল ও জলজ বসতি ধ্বংস ও অবক্ষয়জনিত কারণে জীববৈচিত্র্য নিঃশেষিত হচ্ছে। এ সকল কর্মকান্ড ঘটে চলেছে কৃষি ব্যবস্থা, বনাঞ্চল, মৎস্য সম্পদ, নগরায়ন, শিল্প কারখানা, পরিবহন ব্যবস্থা, পর্যটন, জ্বালানি, রাসায়নিক, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সেক্টরসমূহে। অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিবেশ ব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়া গভীর ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে মৎস্য ও অন্যান্য জলজ জীববৈচিত্র্য।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশে পরিবেশগত বড় ধরণের বিপর্যয় মোকাবেলা করার মতো প্রযুক্তি বা সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একারণে বড় ধরণের পরিবেশগত বিপর্যয় যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য সরকার দেশের পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন

ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। ভূমি, পানি সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশজ উৎপাদে বিশেষ অবদান রাখে। একটি নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে এ তিন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সমন্বয় সাধন তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকার জুন ২০০১ সালে 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, বাংলাদেশ' অনুমোদন করেছে। ভূমি অবক্ষয় রোধে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য নীতি ও ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি, জাতীয় পরিবেশ আইন ও বিধিমালা, জাতীয় বন নীতি, কৃষি নীতি এবং কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পানি সম্পদ ও জাতীয় পানি নীতি

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পানি সম্পদ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ভবিষ্যতে পানি সম্পদ সংরক্ষণ, বাংলাদেশের প্রাপ্যতা, হিস্যা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান পানি সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানসহ একটি সমন্বিত পানি নীতি প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক পানি নিরাপত্তা গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনা এবং পানিসম্পদ রক্ষা ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে আঞ্চলিক সহযোগিতা অপরিহার্য। ভারতের সঙ্গে ১৯৯৭ সালে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। অবশিষ্ট ৫৩টি নদীর পানির হিস্যার ব্যাপারে বিশেষত অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, খোয়াই, গোমতি ও মুহুরি নদীর পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। নেপাল ও ভারতের সঙ্গে সপ্তকোষী প্রকল্পে বাংলাদেশের ন্যায্য অংশীদারিত্ব অর্জনের চেষ্টা করা হবে। ১৯৯৯ সালে প্রণীত 'জাতীয় পানি নীতি' বর্তমান সরকার পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করবে।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন করা হবে। গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড় ও পুকুরসহ প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো খননের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ পানির অপরিমিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, লবণাক্ততারোধ, নদ-নদী ও জলাশয় অবৈধ দখলমুক্ত করা, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, ব্রিজ নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি রোধ, নদীর ভাঙ্গন রোধ ও বন্যা সমস্যা স্থায়ী সমাধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। অববাহিকাকে বিবেচনা করে কতিপয় নির্দিষ্ট জলপথকে চির নাব্য রেখে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। একদিকে যমুনা-মেঘনা আর অন্যদিকে পদ্মা-গড়াই এবং দক্ষিণ এলাকার বড় বড় খালকে পানি নিষ্কাশনের জন্য নিয়মিত ড্রেজিং এবং প্রয়োজনীয় জলাধার নির্মাণে জোর দেওয়া হবে। দেশের ২ কোটি লোকের বসতি হাওড় এলাকাকে পশ্চাৎপদ ও বিপদসংকুল অবস্থান থেকে সম্পাদশীল প্রাগ্রসর এলাকায় পরিণত করার জন্য ১৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। হাওর কার্যক্রম পরিষদের হাওর উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ওয়ারপোতে জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (NWRD) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ডাটাবেসে এ পর্যন্ত দেশের পানি সম্পদ খাতসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের তথ্য/ উপাত্ত ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত ছাড়াও এ ডাটাবেসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মডেল ও বিশ্লেষিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরিকল্পনা ও গবেষণা কাজে NWRD' এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে।

এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ যেমন-(১) দেশের বিভিন্ন নদ নদীতে টাইডাল ও নন-টাইডাল মিলে মোট ৩৪৩টি স্থানে পানির সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, (২) ২৬৯টি স্থানে বৃষ্টিপাত তথ্য সংগ্রহ, (৩) ৩৯টি স্থানে ইভাপোরেশন তথ্য সংগ্রহ, (৪) বিভিন্ন নদ নদীর টাইডাল ও নন-টাইডাল মিলে মোট ১১০টি স্থানে প্রবাহ পরিমাপ কাজ এবং (৫) ৬০টি স্থানে প্রস্থচ্ছেদ (Cross-Section) পরিমাপ কাজ সারা বছর ব্যাপী সম্পন্ন করা হচ্ছে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

বায়ু দূষণ মোকাবেলার লক্ষ্যে দেশে বেশ কিছু আইন ও বিধি বলবৎ রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ুদূষণ রোধে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ঢাকা মহানগরীতে দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি হুইলার মটরযান চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিএনজি চালিত ফোর স্ট্রোক থ্রি হুইলার যানবাহন প্রচলন করা হয়েছে এবং সকল প্রকার পেট্রোল চালিত যানবাহনে সিএনজি ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে'র আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা শহরে মোট পাঁচ (০৫) টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় বায়ু দূষণ পরিমাপের জন্য দুটি মোবাইল এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন সংগ্রহ করা হয়েছে। বায়ুর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন Clean Air Sustainable Environment (CASE) প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত সমীক্ষাসমূহ করা হয়েছে- i) Pedestrian Infrastructure and Traffic Engineering, ii) Brick-Kill Emission Management, iii) Pre-Feasibility Study for Bus Traffic Transit, iv) Media Consultancy for Clean Air.

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে জনসংখ্যা, যানবাহনের সংখ্যা, কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দূষণ নিঃসরণ পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে সার্কের অঙ্গ সংগঠন South Asia Cooperative Envieronment Programme (SACEP)-এর ৭ম গর্ভণিং কাউন্সিলের সভায় 'Male Declaration on Control and Prevention of Air Pollution and its likely Transboundary Effects for South Asia' গৃহীত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর উক্ত ঘোষণাপত্রের আওতায় পর্বভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় একটি Transboundary Air Pollution Monitoring Station স্থাপিত হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে দ্বিতীয় Transboundary Air Pollution Monitoring Station স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় ফসলের ওপর ওজোন (Ozone/O_3) এর প্রভাব নির্ণয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। গবেষণায় ফসলের ওপর ওজোনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ৩টি স্কুলে শিশু স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব নিরূপন বিষয়ক আরও একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বায়ুদূষক হিসেবে চিহ্নিত PM_{10} এর মাত্রা হ্রাস বৃদ্ধির কারণে এজমার প্রকটতার হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। বায়ুদূষণ রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জন্য প্রচার সামগ্রী প্রণীত হচ্ছে। জনসাধারণকে বায়ু দূষণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের ওয়েব সাইট (WWW.doe-bd.org) খোলা হয়েছে। সংশোধিত পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা প্রস্তুত ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সালের তফসিল ২ এ বর্তমান বায়ুর মানমাত্রা সংশোধনপূর্বক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ইট ভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ দূষণরোধকল্পে সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটার বিকল্প হিসেবে কমপ্রেস পদ্ধতির পরিবেশ-বান্ধব ব্লক ইট প্রচলন উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ (সংশোধন ১৯৯২ ও ২০০১) যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর আওতায় ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ (বিধিমালা) ২০০৪ প্রণয়ন করা রয়েছে। দেশের ইটের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের দিক বিবেচনায় রেখে খসড়া ইটভাটা নীতিমালা প্রনীত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন Clean Air Sustainable Environment (CASE) প্রকল্পের আওতায় পরিবেশবান্ধব ইট পোড়ানোর প্রযুক্তি প্রদর্শন ও প্রচারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১০ সালের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতির ইটের ভাটা বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ

দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে মার্চ, ২০০২ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। পাহাড় কাটা বন্ধে এলাকাবাসীর সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলে অবৈধভাবে পাহাড় কাটার প্রবনতা কমে আসছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য কিনা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে পরিবেশ দূষণ সহনীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ইতোপূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর-এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের ইটিপি স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং এ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সেপ্টেম্বর ২০০৭ এ ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক ইটিপি মেলার আয়োজন করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০০২-২০০৫ সালের এক জরিপে ১১,১৪৯ টি শিল্প কারখানার মধ্যে ৫২৪ টি শিল্প কারখানাকে লাল তালিকাভুক্ত করে। লাল তালিকাভুক্ত ৪১৯ টি শিল্প কারখানা নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপি তৈরী করে । লাল তালিকাভুক্ত অবশিষ্ট ১০৫ টি শিল্প কারখানায় ETP স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া, শিল্প দূষণ হ্রাসকল্পে ২০০৬ এর নভেম্বর থেকে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় চারটি দল কাজ করছে । এ পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৯৪৫টি শিল্প কারখানা, হাসপাতাল/ক্লিনিক ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়েছে ।

বৃহত্তর ঢাকা জেলায় শিল্প কারখানার সংখ্যা ও দূষণের মাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ু দূষণ সংশ্লিষ্ট 'সার্ভে এন্ড ম্যাপিং অব এনভায়রণমেন্টাল পল্যুশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ ইন গ্রেটার ঢাকা এন্ড প্রিপারেশন অব স্ট্র্যাটেজিস ফর ইটস মিটিগেশন' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিল্প-কারখানার সঠিক অবস্থান, ধরণ, আকার, নির্গত বর্জ্যের বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্যমান আইন মেনে কারখানাগুলো পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। পরিবেশ দূষন নিবারনের কৌশল ঠিক করার জন্য এসব তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এ শব্দ দূষণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা থাকায় তা সময়োপযোগী করার জন্য সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসহ সর্বসাধারণের মতামতের আলোকে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালার আওতায় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক শব্দ দূষণ বিশেষতঃ মাইক এবং উচ্চমাত্রার হর্ণ এর শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের মধ্যে ঢাকা শহরের শব্দ দূষণের মাত্রা বর্তমানে ৯০-১১০ ডেসিবল হতে ৪৫-৫৫ ডেসিবলে হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সকল প্রকার যানবাহনে হাইড্রলিক হর্ণ নিষিদ্ধকরণসহ ঢাকার কয়েকটি সড়কে গাড়ীর হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ করেছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। বন নীতি ও পরিবেশ নীতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়স্থল হিসেবে দেশে তিন শ্রেণীর সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দেশের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইকো-ট্যুরিজম, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে ১৯টি সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকন্তু, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর ও মারজাত বাওর, গুলশান-বারিধারা লেক ও সুন্দরবন এ ৮টি এলাকাকে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার 'প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা' (Ecologically Critical

Area-ECA) হিসাবে ঘোষণা করেছে। রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য টাঙ্গুয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর ও জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে।

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস (GEF) এবং UNDP-এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওর' (CWBMP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ইসিএ সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাধারণ ও দরিদ্র জনগণকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৭২টি গ্রাম সংরক্ষণ দল(ভিসিজি) গঠন করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে সমাজভিত্তিক নার্সারী এবং মৎস্য ও বন্য প্রাণীর জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাখি শিকার রোধ, জলজ উদ্ভিদ লাগানো ও পাখির অভয়ারণ্য তৈরীর কারণে বিভিন্ন হাওরে ফিরে আসছে অতিথি পাখি। সম্প্রতি CWBMP প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ দেশের বৃহত্তম হাওর (আয়তন প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর) হাকালুকি হাওরে ৫৫ প্রজাতির পাখি দেখা গেছে। এটা ২০০৬ সালের চেয়ে ২ গুন বেশী।

উল্লেখ্য, সুন্দরবনের অংশবিশেষ (পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ) এবং টাঙ্গুয়ার হাওর-কে রামসার এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৭ সনের ৬ ডিসেম্বর ইউনেসকো 'সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান' (World Heritage Site) হিসেবে ঘোষণা করে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ উক্ত কনভেনশনে ১৯৯২ সালে স্বাক্ষর এবং ১৯৯৪ সালে তা রেটিফাই করে। বাংলাদেশ অক্টোবর ২০০১ সালে কিয়োটো প্রটোকল Access করেছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণকল্পে প্রণীত National Adaptation Programme of Action (NAPA) ডকুমেন্টটি ২০০৫ সালে প্রণয়নপূর্বক ক্লাইমেট চেঞ্জ সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫ এ কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত ইউএনএফসিসিসি'র একাদশ কনফারেন্স অব পার্টিজ এর সাইড ইভেন্টে বাংলাদেশের NAPA উপস্থাপিত হয় এবং তা বিভিন্ন মহলের প্রশংসা লাভ করে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ UNFCCC -এর আওতায় GEF-UNDP এর অর্থায়নে Initial National Communication প্রস্তুত করে অক্টোবর ২০০২ সালে UNFCCC সচিবালায় প্রেরণ করেছে এবং বর্তমানে Second National Communication এর আওতায় Green House Gas (GHG) Inventory, অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-কারখানা, যানবাহন এবং অন্যান্য কোন কোন খাত হতে কি পরিমাণ GHG নির্গত হয় তা নিরুপণ করা হবে, একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত Adaptation (অভিযোজন) এবং Mitigation (প্রশমন) এর ক্ষেত্রে কি কি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং কি কি কার্যক্রম গৃহীত হবে তা নিরুপণ করা হবে।

নোবেল বিজয়ী জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃ সরকার প্যানেল (আইপিসিসি) মনে করে, জলবায়ু বিপর্যয়ে বিশ্বের যে কটি দেশ ও অঞ্চল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে উচ্চতা এবং ঝড়-সাইক্লোন ক্রমেই বাড়তে থাকবে। দেখা দেবে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট, বেড়ে যাবে রোগব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সমস্যাগুলোকে জটিল করবে। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের যে সব ব্যাপক ঝুঁকি রয়েছে তা মোকাবেলার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-2008 শীর্ষক একটি জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা তৈরী করছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় ঝুঁকি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানিয়ে চলার ক্ষমতা ও ক্ষতি প্রশমনের জন্য চলতি অর্থবছরের (২০০৮-০৯) বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল নামে তিনশত কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে।

স্বল্পোন্নত দেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও বিরূপতা মোকাবেলায় ইউএনএফসিসিসি কর্তৃক এলডিসিএফ (Least Developed Countries Fund) এবং এসসিসিএফ (Special Climate Change Fund) নামে দু'টি তহবিল রয়েছে। উক্ত এলডিসি ফান্ড হতে বাংলাদেশের NAPA সংশ্লিষ্ট Community-Based Adaptation to Climate Change Through Coastal Afforestation in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটি বন অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে। উল্লেখ্য ইউএনএফসিসিসি ইতোমধ্যে Adaptation Fund গঠন করেছে। ১৬ সদস্য বিশিষ্ট Adaptation Fund বোর্ডে স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণীতে বাংলাদেশকে বিকল্প সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। Adaptation Fund থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভবিষ্যতে সবচেয়ে বেশী আর্থিক সহায়তা পাবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'U.K.-Bangladesh Climate Change Conference: Bangladesh Facing the Challenge' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে একটি Multi Donor Trust Fund (MDTF) গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলে যুক্তরাজ্য সরকারের নিকট হতে ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পাওয়া যাবে। উক্ত সম্মেলনে যুক্তরাজ্য সরকার কর্তৃক ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড অনুদান সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি Communique স্বাক্ষরিত হয়। ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডের মধ্যে ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড (৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) MDTF গঠনের পর তার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের Strategy বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহৃত হবে। এ ছাড়া ডেনমার্ক সরকার প্রস্তাবিত Trust Fund এ ১০ মিলিয়ন Danish Kroner (১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অনুদানের আশ্বাস দিয়েছে। MDTF গঠিত হলে উক্ত অর্থও এ তহবিলে জমা হবে। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। JICA পরিবেশ সংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ পর্যন্ত তিনটি অর্থ বছরে মোট ৪৯০ কোটি টাকার বাজেট সহায়তা দেবার (Climate Change Programme Loan) প্রস্তাবনা দিয়েছে। জাপান JDCF ঋণ বাবদ সুদ হিসেবে পাওনা ৭০০ কোটি টাকা মওকূফ করে তা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। বড় ধরণের পরিবেশ বিপর্যয় ও এর ক্ষয়ক্ষতি রোধে সুপারিশকৃত MDTF গঠনের কাজটি ইতোমধ্যে অনেকখানি এগিয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলটি এরই মধ্যে মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকার ইতোমধ্যে National Climate Change Strategy and Action Plan এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে। এটি কার্যকরী করে খাদ্য নিরাপত্তা, সেবা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন হ্রাসসহ মোট ৬টি পিলারের মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ কার্যক্রম নেয়া হবে।

UNFCCC এবং Kyoto Protocol -এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তার ওপর আগামী ডিসেম্বরে, ২০০৯ -এ কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিতব্য Conference of the Parties 15 (COP-15) -এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে। আগামী ডিসেম্বর ২০০৯ -এ কোপেনহেগেন এ অনুষ্ঠিতব্য COP -১৫ এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে চুক্তি স্বাক্ষর হবে তার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে বিশ্ববাসী একযোগে কাজ করবে।

ওজোন স্তর রক্ষা

ওজোন স্তর রক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে এরোসল সেক্টর-এর ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ওডিএস) Phase out করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশে ওডিএস-এর বাৎসরিক ব্যবহার প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া রেফ্রিজারেশন সেক্টরে অহেতুক সিএফসি নির্গমণ রোধকল্পে রিকভারী ও রিসাইক্লিং প্রকল্পের আওতায় সার্ভিসিং শপের মালিক ও টেকনিশিয়ানদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রায় দুই হাজার টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ওডিএস এর আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। National Phase-out Plan প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১০ সালের মধ্যে রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টর থেকে ১০০% সিএফসি ব্যবহার হ্রাস করা হবে।

ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন

Global Environment Facility (GEF) এর সহায়তায় কার্টেহেনা প্রটোকলের প্রভিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট এর আওতায় বায়োসেফটি গাইডলাইন্স অব বাংলাদেশ ও ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রকাশনা সম্পন্ন করে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বায়োসেফটি সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ বায়োসেফটি ক্লিয়ারিং হাউজ নামক ওয়েব পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে।

হাসপাতাল/ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ

শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে গৃহস্থালী ও অন্যান্য বর্জ্যের পরিমাণ। বর্জ্যের পরিমানণ হ্রাস, পুনঃ ব্যবহার এবং পুনঃচক্রায়নের জন্য পৃথিবীব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঢাকা শহরে সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক এণ্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন একযোগে কাজ করছে। তাছাড়া সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিকল্পিতভাবে বায়ু দূষণ প্রশমন, শিল্প ও যানবাহনজনিত পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরামর্শ/নির্দেশনা অনুসরণে ইতোমধ্যে বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিকে গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং ক্লিনিক্যাল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১৩৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিধির খসড়া প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে বিদ্যুৎ ও জৈব সার উৎপাদনেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। JICA-র সহায়তায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২০ বৎসর মেয়াদী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) -র সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস, পুনঃ ব্যবহার ও পুনঃ আবর্তন সংশ্লিষ্ট (3R-Reduce, Reuse & Recycle) National Strategy on waste reduce, reuse and recycle শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

নগরীর বিপুল পরিমাণ বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে সিডিএম প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জাপানের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (JICA)-র সহায়তায় কুষ্টিয়া পৌরসভায় বর্জ্য থেকে Pilot Composting Project Plant স্থাপন করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম

পরিবেশ সংরক্ষণে সকল স্তরের জনগণকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর প্রাথমিকভাবে কার্যক্রমের আওতায় ছাত্র/ছাত্রীদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঢাকাস্থ বিভিন্ন শিশু সংগঠন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত শিশু পত্রিকার সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০০৮ উপলক্ষে ঢাকার শতাধিক স্কুলে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সরকারের মূল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত সাইক্লোন, খরা, ঝড় ইত্যাদির পূর্বাভাস, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) আবহাওয়া সংক্রান্ত স্যাটেলাইট তথ্যাদি এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র' বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত অন্যান্য সংস্থাগুলো হলো ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।

ভূমিকম্পসহ অন্যান্য যে কোন বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও উদ্ধার কাজ ত্বরান্বিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্পের আওতায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ব্যাপক প্রচারণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন, সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিপোর্টিং এর জন্য মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড ঘোষণা, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে ক্ষুদ্রঋণ এর ব্যবহারকল্পে এডভোকেসী কর্মশালার আয়োজন ইত্যাদি। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনটি জাতীয় কমিটি কাজ করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কমিটি ব্যতীত অন্যান্য যে সব কমিটি রয়েছে সে গুলো হচ্ছেঃ

- Cyclon Preparedness Program Implementation Board (CPPIB)
- Disaster Management Training and Public Awareness Building Task Force (DMTATF)
- Focal Point Operation Coordination Group of Disaster Management (FPOCG)
- NGO Coordination Committee on Disaster Management (NGOCC)

এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে সমন্বয়, পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

পরিবেশ সংরক্ষণে এনজিও কার্যক্রম

দেশের পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা এবং পরিবেশ ব্যবস্থা উন্নয়নে আশি'র দশক থেকে সরকারের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে সংগঠিত করার ব্যাপারে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন), সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি), বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস), এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন ম্যানেজম্যান্ট সেন্টার, ওয়েস্ট কনসার্ন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) ইত্যাদি।

বন অধিদপ্তর

দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষায় বন অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রাচীন। বাংলাদেশ বন বিভাগ-এর জন্মলগ্ন থেকেই মূল উদ্দেশ্য ছিল বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা (Sustained Yield Management)। বনায়ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমায় এবং এর ফলে সৃষ্ঠ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে। বর্তমান সরকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ভূমি বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার জোরালো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯টি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৫টি এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সংরক্ষিত সকল এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মেদাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন, মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন, চর কুকরী মুকরী এলাকায় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য স্থাপন, চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই উপজেলায় ইছাখালী এলাকায় মহুরী মেরিন ইকো-পার্ক স্থাপন এবং ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়া সিডর এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র রক্ষায় সেখানে ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Rehabilitation of Sidor's Damage and Climate Change Resilient Afforestation' শীর্ষক প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত সামাজিক বনায়ন হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ অব্যাহত আছে।
- সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে ট্রি ফার্মিং ফান্ড (Tree Farming Fund) গঠন করা হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে, যেমন- (ক) বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো পার্ক স্থাপন, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়), (খ) বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলাগড় ও বড়শীজোড়ায় ইকো পার্ক স্থাপন, (গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন (ঘ) ধানসিঁড়ি ইকো পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন (ঙ) সুনামগঞ্জ জেলায় রীডল্যান্ড সমন্বিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প (চ) পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটায় ইকোপার্ক স্থাপন, (ছ) মাধবকুন্ড জলপ্রপাত এলাকায় ইকো পার্ক স্থাপন (জ) শেরপুর জেলার মধুটিলা ইকোপার্ক স্থাপন (২য় পর্যায়) এবং (ঝ) আগর বাগান সৃজন (প্রথম পর্যায়)।

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বন অধিদপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ১৯৮১ সাল হতে অদ্যাবধি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় মোট চারটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। অদ্যাবধি বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের অধীনে জবর দখলকৃত এবং অবক্ষয়িত বনভূমিতে ৫৬৪৮৪ হেঃ বাগান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজন করা হয়েছে। বন অধিদপ্তর বিগত ৩ বছরে ৪৬,০২১ জনকে সামাজিক বনায়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সরকারি সম্পদে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। ভবিষ্যতে ভূমির ক্ষয়রোধ, বনভূমির অবক্ষয় রোধ, নতুন জেগে উঠা চরভূমির স্থায়িত্ব এবং ভূমির গুণগত মান বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরে ৫১,০০০ হেক্টর ব্লক বাগান সৃজন, ৭৮৫৫ কি মি স্ট্রীপ বাগান সৃজন, ৭৮,৫৫ (প্রায়) লক্ষ টি চারা প্রতিষ্ঠান/বসতবাড়ী বনায়ন এবং ৪৩.৮০ লক্ষ টি চারা জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় ও বিতরণ করা হবে। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে দরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরা অংশ গ্রহণ করছে এবং লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারের একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। বর্তমানে রীডল্যাড সামাজিক বনায়ন প্রকল্প, আগর বাগান সৃজন (১ম পর্যায়), বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

বনায়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে মহিলাদের স্বাধীনতায় সামাজিক বাধা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। কাঠ ও জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবেশের উন্নয়ন সাধন ছাড়াও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প

বাংলাদেশ বন বিভাগ ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে 'নিসর্গ সহায়তা' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ৬১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচ বছর (২০০৪-০৫ হতে ২০০৮-০৯) মেয়াদি এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে যেটুকু প্রাকৃতিক বন অবশিষ্ট আছে সে প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং অবশিষ্ট বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য একটি টেকসই মডেল উদ্ভাবন করা। বন বিভাগ এটা মনে করে যে, এ প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে প্রকল্পের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততার উপর। তাই বন বিভাগ প্রাকৃতিক বন রক্ষায় জনগণকে সাথে নিয়ে গঠন করছে একটি 'সহ ব্যবস্থাপনা' (co-management) মডেল। উক্ত মডেল প্রাকৃতিক এলাকার মধ্যে ও আশেপাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এবং বন বিভাগ প্রাকৃতিক বন ও প্রকৃতি রক্ষায় একযোগে কাজ করবে। প্রাকৃতিক বন থেকে যদি কোন আয় হয় তা সরকার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী ভাগ করে নেবে। প্রাথমিক অবস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া, হবিগঞ্জের রেমাকালেংগা ও সাতছড়ি, চট্টগ্রামের চুনতি ও কক্সবাজারের টেকনাফ এই ৫টি বনাঞ্চলে এ 'সহ ব্যবস্থাপনা মডেল' চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক, টাঙ্গাইলে সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন প্রকল্প

বরেন্দ্র অঞ্চল দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। মরুপ্রবণতা, খরা, অনাবৃষ্টি, উচ্চ তাপমাত্রা, ভূ-উপরিস্থ পানির দুষ্প্রাপ্যতা এবং স্বল্প বৃক্ষরাজি বরেন্দ্র এলাকার বৈশিষ্ট্য। কৃষি কাজের মাধ্যমে এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সেচের ব্যবস্থা, ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য সহজে পরিবহন, খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২২.৫২ কোটি টাকা ব্যয় বিশিষ্ট 'বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত। সার্বিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকায় ফলের চাহিদা পূরণসহ বনায়নের ফলে এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ)

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম একটি জাতীয় উদ্ভিদ সমীক্ষা, সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ গবেষনা প্রতিষ্ঠান। দেশের ঐতিহ্যবাহী গাছপালাসহ যাবতীয় বৃক্ষলতা প্রজাতির সনাক্তকরণ ও এদের নমুনা সংরক্ষণ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের মূল উদ্দেশ্য। বিএনএইচ এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

- **উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রমঃ** জুলাই ২০০৮ হতে অদ্যাবধি মৌলভীবাজার, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১২০০ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- **উদ্ভিদ সনাক্তকরণঃ** চলতি অর্থ বছরে Taxonomic Studies-এর মাধ্যমে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাগুলো হতে ৫১৮টি উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক আরো ২০০ প্রজাতির উদ্ভিদ সনাক্ত করেছে। উক্ত জেলাসমূহ থেকে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিএনএইচ কর্তৃক সম্পাদিত Flora of Bangladesh সিরিজ প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় দুইটি Angiospermic family (Fascicle No. 59 & 60) এর প্রকাশের জন্য পান্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফ্লোরা এন্ড ফনা অব বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মসূচিটি ২০০৯ সালে শেষ হবে। পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিতব্য এবং স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় ভেষজ উদ্ভিদ, পরিচিতি, চাষ্য ও ব্যবহার বিধি-৩ ম্যানুয়েল প্রস্তুতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের বনজ সম্পদের বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বনজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পরিবেশের উন্নয়ন বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা বিএফআরআই-এর প্রধান লক্ষ্য।

উক্ত ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছেঃ

- কঞ্চি কলম ও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে ব্যাপক বাঁশ চাষ;
- নার্সারী ও বন বাগানের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;
- স্বল্পমূল্যে পার্টিকেল বোর্ড তৈরীর কৌশল;
- স্বল্পখরচে ও স্বল্পশ্রমে বৃক্ষ চারা রোপনের সহজ পদ্ধতি;
- রাসায়নিক সংরক্ষনী প্রয়োগে গ্রামীণ বসতবাড়ির নির্মাণসামগ্রী এবং পান বরজে ব্যবহৃত বাঁশ সামগ্রী ও বাঁশ-বেতের আয়ুস্কাল বর্ধন;
- অগ্রগন্য বৃক্ষ প্রজাতির জন্য ভলিউম, বায়োমাস-টেবিল প্রস্তুতকরণ এবং বৃদ্ধির হার ও উৎপাদন মডেল নিরূপন;
- জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কপিস ব্যবস্থাপনা ও এর আবর্তন কাল পদ্ধতি;
- পাহাড়ী ভূমিতে চাষাবাদের বিকল্প ও লাগসই প্রযুক্তি;
- উন্নত মানের বৃক্ষ বীজের উৎপাদন ও সংগ্রহ নির্দেশিকা;
- টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে বাঁশ ও হাইব্রিড একাশিয়ার বংশবিস্তার।

উল্লিখিত নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও বিএফআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত ডেমোনেস্ট্রেশন, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি-পর্যায়ে কারিগরি ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

বিএফআইডিসি বাংলাদেশের বনভূমি থেকে বনজ সম্পদ আহরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, রাবার বাগান সৃষ্টি, কাঁচা রাবার উৎপাদন ও বাজারজাতকরাসহ বনজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। কর্পোরেশনের কার্যক্রম শিল্প ও কৃষি-এ দু'টি সেক্টরে বিভক্ত। বিএফআইডিসি'র ৩টি রাবার জোনের ১৬টি রাবার বাগান গত চার/পাঁচবছর থেকে লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। রাবার বাগানগুলো ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ২৫.৮০ কোটি টাকা, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৩২.৬০ কোটি টাকা এবং ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪.১৯ কোটি টাকা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিএফআইডিসি'র আওতাধীন ৩২৬৩৫ একর আয়তন বিশিষ্ট বনভূমিতে সৃজিত ১৬টি রাবার বাগান থেকে উৎপাদিত রাবার দেশের মোট রাবার চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশ পূরণসহ ৫০১৫ জন লোকের কর্মসংস্থান এবং রাবারের শীর্ষ সংগঠন হিসেবে বেসরকারি খাতে রাবার চাষ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে। গুণাগুণ পরীক্ষায় রাবার কাঠ সেগুন কাঠের সমতূল্য বলে গণ্য। বিএফআইডিসি'কে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছেঃ

- জাতীয় রাবার নীতি প্রণয়ন;
- রাবার বাগানসমূহের কারখানা ও ধূমঘর আধুনিকায়ন, রাবার চুরি ও পাচার রোধে সশস্ত্র রাবার গার্ড বাহিনী তৈরী, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মধ্যে ৫৩৩২ একর জমিতে পুনঃ বাগান সৃজন;
- শিল্প ইউনিটসমূহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে উন্নত মানের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র তৈরী করে স্থানীয় চাহিদা মেটানো ও বাজার প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা;
- গ্রামীণ জনপদে বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চল ও মধুপুর গড় অঞ্চলে ব্যক্তি ও সরকারী পর্যায়ে রাবার চাষ সম্প্রসারণ করে হতদরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৬৭০০ মেঃ টন রাবার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের মধ্যে কাঁচা রাবার রপ্তানির উদ্দীপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

পরিবেশ বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ২৮টি প্রকল্প (১৬টি বিনিয়োগ ও ১২টি কারিগরিসহ প্রকল্প) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর বিপরীতে মোট ৬৯.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত এসব প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ২৫.৯৬ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৬৫ শতাংশ। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ -অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে উক্ত মন্ত্রণালয়ের মোট ৩৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৭.১৮ কোটি টাকা। এছাড়া চলতি অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৩৩.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১ টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি অর্থবছরে কর্মসূচিগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত ১০.১৭ কোটি টাকার মধ্যে মার্চ ০৯ পর্যন্ত ৪.২২ কোটি ব্যয় হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৪২ শতাংশ।

দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এসকল প্রকল্প, কার্যক্রম ও কর্মসূচি ছাড়াও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ পরিবেশ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি জমিতে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দেয়ার পরিবর্তে নতুন পদ্ধতিতে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করছে, যা ইউরিয়া সারের সাশ্রয়সহ পরিবেশের দূষণ রোধে ভূমিকা রাখছে। বন ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন, সাফারী পার্ক উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সরাসরি জীব বৈচিত্র সংরক্ষণসহ সার্বিকভাবে দেশের পরিবেশ উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখছে।